ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ৬৭-৮০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4106

বাংলায় নগর জনসংখ্যার পরিবর্তন (১৯০১-১৯৪১): একটি সমীক্ষা

ড. রওশন আরা আফরোজ
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The history of urbanization in Bengal is luminous with its different features in the continuity of time. Having passed the stages of ancient and medieval urbanization, Bengal and India became familiar with modern urbanization during the rule of the British East India Company. Before that capital, administration and trade were considered as the main directrix of the urban centers. During the British period, for their own convenience of revenue collection, new elements were created in the urban system by forming new small administrative units. Apart from the capital or administrative reason, since ancient times, the exchange of agricultural products were established in geographically important populated areas. Those exchange centers gradually transformed into urban centers. In this process traders, artists and artisans had started to build shops and houses. As the population continued to increase, urban structures were built up in those places. This process continued for centuries. Towns and urban centers came into being around the newly created small administrative units of the British government as well as the residences of the administrative officers. That is, the population of a place and its growth is an indispensable element in the development of cities because the class character of cities change with population growth.

Key Words: Urbanization, Small administrative units, Development of cities, Population growth.

ভূমিকা: নগরায়ন মানব সুলভ একটি জীবনযাত্রা প্রণালী। নগর বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়, যেখানে ভৌগোলিকভাবে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী স্থানের চেয়ে মানুষের বসবাসের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থাদি রয়েছে, যেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ অকৃষি ভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত থাকে। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা যোগাযোগ ব্যবস্থা নগর এলাকাটিকে পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করে এবং সে স্থানের জনসংখ্যার ঘনত্ব ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। আর এভাবে নগরের ক্রমোন্নতিকে নগরায়ন বলে আখ্যায়িত করা যায়। ফিলিপ এম হাওজার বলেন, নগরায়ন হলো নগরীয় জনসংখ্যার বিস্তরণ ও পরিবর্তনের বিন্যাস অনুশীলন।[১] বাংলায়

নগরায়ন সংঘটনেও এ প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোম্পানি শাসনামলের শুরু থেকেই তাদের সৃষ্ট ভূমিনীতি ও ভূমি রাজস্ব-ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, বিচার বিভাগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। এ পরিবর্তনে পুরাতন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ১৮৭২ সালের পূর্বের নগর জনসংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। এসময় থেকে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ব্রিটিশ শাসনের শেষ অর্ধশতকে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রেলপথের বিকাশ, নতুন নতুন শিল্প কারখানা সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক জীবনবোধ মানুষকে অধিক নগরমুখি করে তোলে। একটি নগর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, উৎপাদন ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু রূপে কাজ করে থাকে। বিনোদন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের চর্চা ও বিকাশের সুযোগ ও সহায়তা সরবরাহ করে। এই কারণে বিভিন্ন পণ্য পরিবহন ও পরিচর্যা, উৎপাদন ও ভোগের জন্য নগরে ব্যাপক মানুষের সমাগম ঘটে। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নত জীবনযাপনের অভিলাষে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিগমন করে থাকে। আর এর ফলে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। প্রবন্ধটি ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ অর্ধশতকে অবিভক্ত বাংলায় নগর জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আলোচ্য কালপর্বে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা পরিবর্তন সম্পর্কিত কোনো গবেষণা একক কোনো প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়নি। বাংলার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য উন্মোচনে এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। ১৯০১ ও পরবর্তী সময়ের সর্বভারতীয় জনশুমারি রিপোর্ট, কিছু গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বর্তমান প্রবন্ধের গবেষণা উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

জনসংখ্যা ও নগরায়ন

কোনো স্থানের মোট জনসংখ্যা ও নগর জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত তা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেখানে নগরায়ন চলছে বলে ধরা হয়। অর্থাৎ নগরের জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে না বাড়লে নগরায়ন হয় না। আবার কেবলমাত্র লোকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে নগরের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় না। কারণ দেখা গেছে বহু ক্ষুদ্র জনসংখ্যা বিশিষ্ট বসতিতে নাগরিক বৈশিষ্ট্য যেমন: জনঘনত্ব, প্রশাসনিক দপ্তর, বাজার ইত্যাদি থাকতে পারে। আবার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অনেক বসতিতে অধিবাসীদের জীবিকা কৃষি হতে পারে। কাজেই সংখ্যা অপেক্ষা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলিই নগরের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও বাংলায় নগরায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা এর পরিবর্তনকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। বাংলার নগরায়নের চিত্র তুলে ধরার পূর্বে নগরায়নের সংজ্ঞা প্রদান করা প্রাসঙ্গিক বলে

মনে হয়। এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রানিকায় বলা হয়েছে যে, 'একটি নগর বা City হল' a relatively permanent and highly organized centre of population of greater size or importance than a town or village.[২] আধুনিক গবেষকগণ নগরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক Gordon Childe নগর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] নগরায়ন বিষয়ে অন্যতম গবেষক আশীষ বোস লিখেছেন, 'Urbanization in the demographic sense is an increase in the population of the urban population (U) to the total population (T) over a period of time. As long as U/T increase there is urbanization.'[৪] অন্যদিকে গবেষক ভারদ্বাজ বলেছেন 'The term 'Urbanization' suggests that the urban population is growing at a faster rate than the average rate of growth of the nation.'[৫] সুতরাং বলা যায় কোনো স্থানের আয়তন, জনসংখ্যা, বৃত্তিমূলক বৈচিত্র্য ছাড়াও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উন্নত জীবন মানের বহুবিধ প্রথার অস্তিত্বই নগর। নগরায়নের জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশে জনবসতি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বসতির সংখ্যা ও বসতির আকার বৃদ্ধি প্রভৃতি।[৬] অর্থাৎ যদি দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায় তাহলে নগরায়ন হয়নি বলে ধরে নেয়া হয়। নগরায়ন হতে হলে অভিগমনও প্রয়োজন। কারণ স্বাভাবিক জন্মহার দ্বারা অনুপাত বৃদ্ধি পায় না।

জনসংখ্যা পরিবর্তন ও বাংলার নগরায়নে এর প্রভাব

নদীমাতৃক বাংলার বৈরী আবহাওয়া ও শাসকশ্রেণির পরিবর্তনে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শহরগুলোর স্থায়িত্ব ছিল খুবই স্বল্প।[৭] ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে কলকাতা, হুগলি, কাশিমবাজার, মালদা, কুমারখালী এ নগরকেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের অনুগত বণিক সম্প্রদায়ের। তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণির এবং শহর কলকাতার কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায় অফিস আদালতে তাদেরই প্রাধান্য বজায় থাকে। তবে সরকারি অফিস আদালতের অধিকাংশ কর্মচারীই ছিল পূর্ব বাংলার লোক।[৮] গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া বলেন, মধ্যযুগীয় গ্রামীণ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটলে নগরায়ন বৃদ্ধি পায়। নগর বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে অফিস, আদালত ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৯] তিনি বি. বি. মিশ্র এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির উদ্ভব ঘটেছিল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনের ছত্রছায়ায় নয়া ভূমি ব্যবস্থা, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে, শিল্পায়ন, সংবাদপত্র, চাকরি ইত্যাদির মাধ্যমে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়। এই শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ শহরের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসে।[১০]

ব্রিটিশ আমলে নগরায়নের পেছনে যে সব উপাদান কাজ করেছিল তার মধ্যে (১) কৃষি ব্যবস্থার অগ্রগতি ও কৃষিতে অত্যধিক চাপের ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা গ্রাম থেকে শহরের দিকে অভিবাসিত হয়, (২) শহরগুলোতে শিল্পায়নের সূচনা হয় যা গ্রামের মানুষকে শহরের দিকে টেনে নিয়ে আসতে থাকে এবং (৩) উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থপ্রসারের লক্ষ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নগর গড়ে তোলার পদ্ধতি পরিচালনা করে। যেমন: ঢাকা, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হুগলি প্রভৃতি। আধুনিক ধারার নগরায়ন মূলত ব্রিটিশ শাসনেরই ফল। ব্রিটিশ শাসনামলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির মধ্য দিয়ে নগরের বিকাশ শুরু হয়। শহরগুলোতে ইতিমধ্যে শিল্পায়ন শুরু হয়। যা মানুষকে শহরের দিকে নিয়ে আসতে থাকে। ফলে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয়।[১১] তাছাড়া সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার্থে ১৮৪৫ সালে জেলাকে আরো ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট মহকুমায় (সাব-ডিভিশন) বিভক্ত করা হয়।[১২] মহকুমা সদর দফতরগুলোতে সরকারি অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় সেগুলো ক্রমেই জনবহুল শহর-নগরে পরিণত হয়। নিচে সারণির সাহায্যে অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যা, শহরের সংখ্যা, গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা এবং এর শতকরা হার দেখানো হলো (১৯০১-১৯৪১):

সারণি ১: বাংলার শহরের সংখ্যা, গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা এবং এর শতকরা হার (১৯০১-১৯৪১)

ধরণ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
মোট জনসংখ্যা	৪,২৮,৮১,৩৫৯	৪,৬৩,০৫,১৭০	৪,৭৫,৯২,৪৬২	৫,১০,৮৭,৩৩৩	৬,১৪,৬০,৩৭৭
গ্রামীণ জনসংখ্যা	৪,০২,৮২,২০১ (৯৩.৯%)	৪,৩৩,৩৬,৯২৩ (৯৩.৬%)	৪,৪৩,৮১,১৫৮ (৯৩.৩%)	৪,৭৩,৭৫,৩৯৮ (৯৩.৭%)	৫,৫৪,৭৭,০৮৭ (৯০.৭%)
নগর জনসংখ্যা	২৫,৯৯,১৫৮ (৬.১%)	২৯,৬৮,২৪৭ (৬.৪%)	৩২,১১,৩০৪ (৬.৭%)	৩৭,১১,৯৪০ (৭.৩%)	৫৯,৮৩,২৯০ (৯.৭%)
নগরের সংখ্যা	১২২টি	১২৪টি	১৩৫টি	১৪৩টি	১৫৬টি

সূত্র: *Census of India, 1901, Vol. VI (A)*, II, 2; *Census of India, 1911, Vol. V, Part-II*, 12-14; *Census of India, 1921, Vol. V, Bengal, Part-II*, Tables, 2, 12; *Census of India, 1931, Vol. V, Bengal and Sikkim, Part-II*, 2, 10; *Census of India, 1941, Vol. IV*, Bengal, Tables by R. A. Dutch, 20-26.

উপরের সারণিতে, শহর-নগরে জনসংখ্যার হার ১৯০১ সালে শতকরা ৬.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪১ সালে ৯.৭%-এ পৌঁছায়। অবিভক্ত বাংলার ৫টি বিভাগের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ছিল পূর্ব বাংলার অন্তর্গত। ১৯০১ সালের জনশুমারি রিপোর্টে জনসংখ্যা অনুসারে নগরগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

প্রথম শ্রেণি- ১,০০,০০০ বা তদুর্ধ্ব।
দ্বিতীয় শ্রেণি- ৫০,০০০-১,০০,০০০।
তৃতীয় শ্রেণি- ২০,০০০-৫০,০০০।

চতুর্থ শ্রেণি- ১০,০০০-২০,০০০।
পঞ্চম শ্রেণি- ৫,০০০-১০,০০০।
ষষ্ঠ শ্রেণি- ৫,০০০ এর নিচে।[১৩]

ভারতীয় জনশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন আকারের শহর-নগরের জনসংখ্যা, শহরের সংখ্যা ও নগর জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ বিভিন্ন শ্রেণির নগরে বাস করে তার একটি হিসাবে দেখানো হলো (১৯০১-১৯৪১):

সারণি ২: শহর-নগরের সংখ্যা, জনসংখ্যা এবং এর শতকরা হার (১৯০১-১৯৪১)

জনসংখ্যার ধরণ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
১,০০,০০০ এর অধিক	১০,০৫,৩৯০ (২টি, ৩৮.৭%)	১১,৮৩,৬২৪ (৩টি, ৩৯.৯%)	১২,২২,৬০২ (৩টি, ৩৮.১%)	১৫,৬০,১২৫ (৩টি, ৪২.০%)	২৮,১৮,৪৪৫ (৪টি, ৪৭.১%)
৫০,০০০-১,০০,০০০ এর মধ্যে	৮৯,৭৩৩ (১টি, ৩.৫%)	১,০৪,১৮১ (২টি, ৩.৫%)	১,৪১,৬০৬ (৪টি, ৪.৫%)	১,৯৬,২৬৫ (৩টি, ৫.৩%)	৮,৯৩,৩২৬ (১৪টি, ১৪.৯%)
২০,০০০-৫০,০০০ এর মধ্যে	৫,০৪,৫৮৪ (১৮টি, ১৯.৪%)	৭,৯৬,৯৯৮ (২৮টি, ২৬.৯%)	৮,৮৬,৭৭৪ (৩৩টি, ২৭.৬%)	৯,৫৬,৪৫৭ (৩২টি, ২৫.৮%)	১৩,৮৫,৪৪৯ (৪৫টি, ২৩.২%)
১০,০০০-২০,০০০ এর মধ্যে	৬,৮২,১৬৬ (৪৭টি, ২৬.২৪%)	৫,৮০,৮৯৩ (৪০টি, ১৯.৫৮%)	৫,১৭,৬৮৬ (৩৭টি, ১৬.১২%)	৬,৪০,৬৪৭ (৪৪টি, ১৭.৩%)	৫,৯৪,৩২৮ (৪৩টি, ৯.৯%)
৫,০০০-১০,০০০ এর মধ্যে	২,৭০,৯২০ (৩৭টি, ১০.৪%)	২,৫১,১১৫ (৩৪টি, ৮.৭%)	২,৮৪,৯৭৫ (৪০টি, ৮.৯%)	২,৮৩,৭৭০ (৩৮টি, ৭.৬%)	২,৬২,৯৯২ (৩৭টি, ৪.৫%)
৫,০০০ এর কম	৪৬,৩৬৫ (১৭টি, ১.৮%)	৫১,১৩৬ (১৭টি, ১.৭%)	৫৭,৩৬১ (১৮টি, ১.৮%)	৭৪,৬৭৮ (২৩টি, ২.০%)	২৮,৭৫০ (১৩টি, ০.৪%)

সূত্র: *Census of India, 1901, Vol. VI (A),* II, 2; *Census of India, 1911, Vol. V, Part-II,* 12-14; *Census of India, 1921, Vol. V, Bengal, Part-II,* Tables, 2-12; *Census of India, 1931, Vol. V, Bengal and Sikkim, Part-II,* 2-10; *Census of India, 1941, Vol. IV,* 20-27.

উপরের তালিকায় বিভিন্ন আকারের শহর-নগরের মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নগরের সংখ্যা খুব একটা পরিবর্তন না হলেও তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণির নগর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তবে নগর জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জনশুমারি রিপোর্টে শহরের ন্যূনতম জনসংখ্যা ৫,০০০ ধার্য করায় প্রায় সকল মহকুমা এবং জেলা সদর, রেলওয়ে শহর ও বড় পাটক্রয় কেন্দ্র শহর হিসেবে পরিগণিত হয়। উপরের তথ্যসমূহ থেকে বলা যায় যে, ১৯০১-১৯৩১ পর্যন্ত কালে ৫০,০০০-এর অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরের সংখ্যা ১টি থেকে ৩টি হয়েছিল। এই বৃদ্ধি স্থানীয়ভাবে বেড়েছিল না অভিবাসনের কারণে তা আলাদাভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

১৯৩১ সালে এক লক্ষের বেশি অধিবাসীসহ শহরের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি। এগুলো ছিল- কলকাতা (১১,৯৬,৭৩৪ জন), হাওড়া (২,২৪,৮৭৩ জন) এবং ঢাকা (১,৩৮,৫১৮ জন)। পশ্চিম বাংলার কলকাতা ও হাওড়া ছিল প্রশাসন ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। পূর্ববাংলায় এক লক্ষের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহর ছিল ১টি- ঢাকা। ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হলে (১৯০৫-১৯১১) এখানে লোকসংখ্যা বাড়ে। ১৯০১ সালে ৮৯,৭৩৩ জন থেকে ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে বেড়ে যথাক্রমে ১,০৮,৫৫১; ১,১৯,৪৫০ ও ১,৩৮,৫১৮ জন হয়। অবশ্য ১৯০৫ সালে নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা শহর, রেলওয়ে শহর (যেমন, সৈয়দপুর), পাট ক্রয় কেন্দ্র (যেমন, সিরাজগঞ্জ) এগুলোতে গ্রামের কর্মজীবী মানুষের চেয়ে জোতদার, জমিদার, ছাত্র-শিক্ষক, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার প্রমুখ আসে অধিক হারে।[১৪] নিচে একটি সারণির সাহায্যে পাঁচটি বিভাগে বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ নগরে বাস করে তার হিসেব দেখানো হলো:

সারণি ৩: ১৯০১-১৯৪১ সময়ে বাংলার মোট জনসংখ্যায় নগর জনসংখ্যার হার

প্রশাসনিক ইউনিট	শুমারি বছর					হ্রাস-বৃদ্ধি
	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	(১৯০১-১৯৪১)
বাংলায়	৬.১২	৬.৪৮	৬.৮২	৭.৩৫	৯.৭৪	+৩.৬২
বর্ধমান বিভাগ	৬.৬৬	৭.২৭	৮.৩৮	৯.৪৩	২১.৩২	+১৪.৬৬
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৬.২৭	১৭.৭৩	১৮.৭৭	১৯.৬৭	৫৫.৮০	+৩৯.৫৩
রাজশাহী বিভাগ	১.৮৬	২.১৬	২.২৮	২.৭৭	৭.২৬	+৫.৪০
ঢাকা বিভাগ	২.৭৩	২.৮২	৩.০২	৩.১০	১০.৭৪	+৮.০১
চট্টগ্রাম বিভাগ	১.৭১	১.৮২	১.৮৮	২.৩০	৪.১৩	+২.৪২

সূত্র: ১৯০১-১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট এর সংশ্লিষ্ট সারণিসমূহ।

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, নগর জনসংখ্যা সর্বাধিক ছিল প্রেসিডেন্সি বিভাগে। আর সবচেয়ে কম ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে। তবে এ বিভাগে শহর সংখ্যাও ছিল সবচেয়ে কম। অন্যদিকে রাজশাহী বিভাগে অধিক শহর হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে এখানে নগর জনসংখ্যা কম ছিল। কারণ হিসেবে বলা যায় পুরো বাংলাই ছিল কলকাতার পশ্চাদ্‌ভূমি। ১৯০১ সালে মোট শহুরে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫,৯৯,১৫৮ জন। ১৯৪১ সালে তা বেড়ে হয় ৫৯,৮৩,২৯০ জন। চল্লিশ বছরে বৃদ্ধি ৩৩,৮৪,১৩২ জন। প্রতি বছরে গড়ে বৃদ্ধি ৮৪,৬০৩ জন।[১৫] এই সারণি অনুসারে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে বাংলায় শহুরে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩.৬২%।

বিভিন্ন বিভাগে নগর জনসংখ্যার পরিবর্তন

১৯১১ সালে নগর জনসংখ্যার ৬৭% হিন্দু ও ৩০% মুসলমান ছিল। সে সময় মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান কিন্তু নগরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সেই হিসেবে নগরের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মুসলিম অনুপাতের দুই গুণ। বাংলার নগরে হিন্দু জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ তারা অধিক হারে শিক্ষিত ছিল। যেহেতু নগরে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা ছিল তাই এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বেশি। আর দরিদ্র শ্রেণির মানুষ এখানে শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করত। প্রেসিডেন্সিতে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা তিন গুণ বেশি ছিল। ১৯১১ সালে বাংলার ১৪টি শহরে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এগুলো ছিল- মধ্য বাংলায় গার্ডেন রিচ, মুর্শিদাবাদ এবং ধুলাইন (Dhulain); উত্তর বাংলায় পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ; এবং পূর্ব বাংলায় শেরপুর (ময়মনসিংহ), কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, কুমিল্লা, পটুয়াখালি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।[১৬] ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে প্রথম শ্রেণির শহরের লোকসংখ্যা ছিল:

সারণি ৪: বাংলার প্রথম শ্রেণির শহরের লোকসংখ্যা (১৯১১-১৯৩১)

শহর	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
কলকাতা	৮,৯৬,০৬৭	৯,০৭,৮৫১	১১,৯৬,৭৩৪
হাওড়া	১,৭৯,০০৬	১,৯৫,৩০১	২,২৪,৮৭৩
ঢাকা	১,০৮,৫৫১	১,১৯,৪৫০	১,৩৮,৫১৮

সূত্র: ১৯১১-১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট এর সংশ্লিষ্ট সারণিসমূহ।

এক দশকের ব্যবধানে প্রথম শ্রেণির শহরের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩১ সালে অবিভক্ত বাংলায় ১৪৩টি শহর পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে মোট শহর সংখ্যায় ১১টি নতুন শহর দেখানো হয়েছে। এ সময় অবিভক্ত বাংলায় ৩টি শহর হ্রাস পেয়েছে। শহরগুলো হলো বীরভূম জেলার বোলপুর, জলপাইগুড়ি জেলার বুক্সা (Buxa) এবং ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ। ১৯৩১ সালে ২৪-পরগণা জেলার মানিকতলা, চিতপুর এবং গার্ডেন রিচ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার সাথে যুক্ত করা হয়। নতুন যুক্ত হওয়া শহরগুলো হলো ৪র্থ শ্রেণির শহর kulti (বর্ধমান) এবং ফেনী (নোয়াখালী); ৫ম শ্রেণির শহর কলিমপং (দার্জিলিং), গৌরিপুর (ময়মনসিংহ), শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), বুরনপুর (বর্ধমান), দমদম (২৪-পরগণা) এবং কন্টাই (মেদিনীপুর); ৬ষ্ঠ শ্রেণির শহর লালমনিরহাট (রংপুর), Ondal (বর্ধমান) এবং নওগাঁ (রাজশাহী)। এর মধ্যে দমদম ও গৌরিপুরকে পৌরশহর হিসেবে এবং ব্যারাকপুর, জলপাহাড় (Jalapahar) এবং লেবং (Lebong) ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে গড়ে ওঠে।[১৭] রামপুরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম (Kurigaon), খড়গপুর (Kharagpur), সৈয়দপুর, পাত্রসর (Patrasair), ডোমার এবং বেলডাঙ্গা-এর প্রথম তিনটি মহকুমার সদর দফতর ছিল।

নীলফামারী ৫,০০০-এর কম জনসংখ্যা হয়েও নগর চরিত্র ধারণ করতে থাকে। এছাড়া খড়গপুর ও সৈয়দপুর রেল বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। পাত্রসর (Patrasair) বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে নগর হয়ে উঠে। ডোমার পাট রপ্তানির জন্য ৫,০০০-এর কম জনসংখ্যা হয়েও নগর হিসেবে পরিচিতি পায়।[১৮]

বৃহৎ নগর হলো ১ লাখ-এর অধিক জনসংখ্যার শহর। এরকম শহর বাংলায় ছিল ঢাকা, হাওড়া ও কলকাতা। এই হিসেবে প্রতি ১,০০০ জনে ৭৩ জন এই তিন নগরে বাস করে। ১৯৩১ সালে ৫টি বিভাগের নগরে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হার ছিল:[১৯]

প্রেসিডেন্সি বিভাগ- ৫৪%
বর্ধমান বিভাগ- ২২%
ঢাকা বিভাগ- ১১.৬%
রাজশাহী বিভাগ- ৭.৯%
চট্টগ্রাম বিভাগ- ৪.৫%।

দেখা যায় ১৯৩১ সালে মোট নগর জনসংখ্যার অর্ধেকাংশই প্রেসিডেন্সি বিভাগে বাস করত। আর পূর্বাঞ্চলের নগর বসতি বেশি ছিল ঢাকা বিভাগে। পশ্চিম বাংলায় নগর জনসংখ্যার শতকরা ৭৬%-এর বাস ছিল। ১৯৪১ সালে নগর জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগে। সে দিক থেকে পূর্ব বাংলা ছিল পিছিয়ে। ঢাকা ছিল এ অঞ্চলের অধিক জনঅধ্যুষিত শহর।

১৯৪১ সালে অবিভক্ত বাংলার পাঁচটি বিভাগের কয়েকটি প্রধান নগর ও এর জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান দেখা যেতে পারে। বর্ধমান বিভাগের বিভিন্ন জেলার ৫০,০০০-এর অধিক জনবহুল শহরগুলো দেখানো হলো:[২০]

সারণি-৫ (ক): বর্ধমান বিভাগ

জেলা	**শহর**	**জনসংখ্যা**
বর্ধমান	বর্ধমান	৬২,৯১০
	আসানসোল	৫৫,৭৯৭
মেদিনীপুর	খড়গপুর	৮৬,১৮৫
	হাওড়া	৩,৭৯,২৯২
হুগলি ও হাওড়া	শ্রীরামপুর	৫৫,৩৩৯
	বালি	৫০,৩৯৭

এছাড়া বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ; বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া, বিশেনপুর; মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর; হুগলি জেলার হুগলি ও চিনশুরা, বাঁশবাড়িয়া, বৈদ্যবাটি, রিশ্‌রা- কোন্নগর,

ভদ্রেশ্বর (Bhadreswar), চাম্পদানি (Champdani) শহরগুলোর লোকসংখ্যা ২০,০০০ অতিক্রম করেছিল। অধিক জনবহুল শহর ছিল হাওড়া। প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রধান শহরগুলো ছিল:[২১]

সারণি-৫ (খ): প্রেসিডেন্সি বিভাগ

জেলা	শহর	জনসংখ্যা
২৪-পরগণা জেলা	টালিগঞ্জ	৫৮,৫৯৪
	দক্ষিণ সাবার্বান	৬৩,৪৭৯
	টিটাগড়	৫৭, ৪১৬
	বারানগর	৫৪,৪৫১
	ভাটপাড়া	১,১৭,০৪৪
	গার্ডেন রিচ	৮৫,১৮৮
কলকাতা	কলকাতা	২১,০৪,২৭৬

২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট, বাজ-বাজ (Budge-Budge), কামারহাটি, ব্যারাকপুর, গারুলিয়া, উত্তর ব্যারাকপুর, পানিহাটি, দক্ষিণ দমদম, নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া (Kanchrapara); নদীয়া জেলার শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর; মুর্শিদাবাদের বুরনপুর; খুলনা শহরগুলোর লোকসংখ্যা ২০,০০০ অতিক্রম করেছিল। দশ হাজারের অধিক জনসংখ্যার শহর বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে বেশ কয়েকটি ছিল। রাজশাহী বিভাগে ২০,০০০-এর অধিক জনসংখ্যার শহরগুলো ছিল:[২২]

সারণি-৫ (গ): রাজশাহী বিভাগ

জেলা	শহর	জনসংখ্যা
রাজশাহী	রাজশাহী	৪০,৭৭৮
দিনাজপুর	দিনাজপুর	২৮,১৯০
জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	২৭,৭৬৬
দার্জিলিং	দার্জিলিং	২৫,৮৭৩
রংপুর	রংপুর	৩৪,০৩৯
বগুড়া	বগুড়া	২১,৬৮১
পাবনা	পাবনা	৩২,২৯৯
	সিরাজগঞ্জ	৪২,০৭৫
মালদা	ইংলিশ বাজার	২৩,৩২৩
	নবাবগঞ্জ	২৩,১৬৪

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী বিভাগে ৫০,০০০-এর অধিক লোকসংখ্যার কোনো শহর ছিল না। তাই এখানে ২০,০০০-এর অধিক জনসংখ্যার শহরগুলো দেখানো হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার তুলনায় পূর্ব বাংলায় এই বৃদ্ধি তুলনামূলক কম ছিল। বৃদ্ধির হার বর্ধমান বিভাগের বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া ও বীরভূমে অধিক ছিল। আবার প্রেসিডেন্সি বিভাগের ২৪-পরগণা ও নদীয়া জেলায় ৫০,০০০-এর উর্ধ্বের লোকসংখ্যার শহর অধিক দেখা যায়। নদীয়া জেলার ১০,০০০-এর কম জনসংখ্যা ছিল কুমারখালী, মেহেরপুর, বীরনগর, চাকদাহ। এছাড়া নাটোর, নওগাঁ, কালিমপং, শিলিগুড়ি, রংপুর, সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জের লোকসংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি ছিল। অবিভক্ত বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৫০,০০০ জনসংখ্যার অধিক শহরগুলো ছিল:[২৩]

সারণি-৫ (ঘ): ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলা	**শহর**	**জনসংখ্যা**
ঢাকা	ঢাকা	২,১৩,২১৮
	নারায়নগঞ্জ	৫৬,০০৭
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৫২,৯৫০
বাকেরগঞ্জ	বরিশাল	৬১,৩১৬
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৯২,৩০১

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের ঢাকাসহ ৫টি শহরের জনসংখ্যা ৫০,০০০ অতিক্রম করেছিল। আর ময়মনসিংহের শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ; ফরিদপুরের ফরিদপুর, মাদারিপুর; ত্রিপুরা জেলার ৩টি শহরেই (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর) ২০,০০০-এর অধিক জনসংখ্যা লক্ষ করা যায়। এছাড়া নোয়াখালীর নগর জনসংখ্যা ১০,০০০ অতিক্রম করেছিল। জনশুমারি রিপোর্টে লক্ষ করা যায় যে পূর্ব বাংলায় হিন্দু জনসংখ্যা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু শিক্ষার হার ছিল পশ্চিম বাংলার হিন্দু সমাজের চেয়ে বেশি। আবার একইভাবে পশ্চিম বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ, কিন্তু পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলায় নগরায়ন ঘটেছে দ্রুত। পশ্চিম বাংলায় হিন্দু লোকসংখ্যা বেশি থাকায় এবং তাদের মধ্য থেকে প্রথম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। তাছাড়া ইংরেজ শাসকবর্গের আনুকূল্য লাভ করায় তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরিতে অধিক সুযোগ লাভ করে। চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের প্রাধান্য বেশি হওয়ায় বাংলার নগরায়ন ও নগর জনসংখ্যায় হিন্দুদের উপস্থিতি বেশি লক্ষ করা যায়। অবিভক্ত বাংলায় প্রতি দশকে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হলো:

সারণি-৬: প্রতি দশকে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

ধরণ	১৯০১-১১	১৯১১-২১	১৯২১-৩১	১৯৩১-৪১
মোট নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি	+৩,৬৯,০৮৯	+২,৪৩,০৫৭	+৫,০০,৬৩৬	+১২,৭১,৩৫০
শতকরা বৃদ্ধির হার	১৪.২	৮.২	১৫.৬	৩৪.২

সূত্র: সংশ্লিষ্ট জনশুমারি রিপোর্ট।

বাংলার নগরায়নে জনসংখ্যা পরিবর্তনের ভূমিকা

অবিভক্ত বাংলায় প্রতি দশকে নগর বৃদ্ধির তুলনায় নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বেশি। আসলে কোম্পানির শাসনের শুরুতে বাংলায় নগরায়নের ধারায় আমুল পরিবর্তন আসে। যেমন: নবাবি ও মুঘল আমলের শহর মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার ন্যায় প্রধান নগরগুলো কোম্পানি আমলে গুরুত্ব হারাতে থাকে। আর সে স্থান দখল করে কোম্পানির শাসনামলে সৃষ্ট প্রধান ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক নগরকেন্দ্রগুলো। কোম্পানির সৃষ্ট প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং রাজস্বনীতি এদেশের নগরায়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায়। এ সময়ের নগরগুলো ঔপনিবেশিক শাসনে প্রভাবিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। পলাশিতে ব্রিটিশদের বিজয় কলকাতাকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি সাধারণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসে। কোম্পানি কর্তৃক দিউয়ানী লাভ (১৭৬৫) স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। স্থানীয় বাসিন্দারা নব প্রতিষ্ঠিত নগর কেন্দ্রটিতে ভিড় জমাতে থাকে, ফলে কলকাতার জনসংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। ১৮৫১ সালে রেলওয়ের সূত্রপাতে কলকাতা একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়। রেলওয়ে ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত হুগলি, বর্ধমান ও রাণীগঞ্জকে কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। ১৮৭৩ সালে সরকার এখানে ট্রাম-সার্ভিস চালু করে যাতে শিয়ালদহ ও হাওড়া রেল স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়। বহুমাত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র হওয়ার কারণে কলকাতাকে শুধু ভারত বা বাংলার রাজধানীই নয় বরং সমগ্র উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবেও বিবেচনা করা যায়।[২৪]

তবে ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলার ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১০ ভাগ এবং এই সংখ্যা ছিল নিঃসন্দেহে বাংলার অন্যান্য মফস্বল শহরের লোকসংখ্যা এবং নগরকেন্দ্রের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ১৯২০-এর দশকে ভারতের নগরগুলোর মধ্যে ঢাকার স্থান ছিল ২৮তম।[২৬] ১৯২১ সালের মধ্যে ঢাকা ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের একটি শহর হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং যা ছিল মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলে (পূর্ব বাংলায়) অবস্থিত। ১৯২১ সালের জনশুমারিতে বলা হয়, 'বাংলায় এমন শহর খুব কমই আছে যেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি'।[২৭] এ ধরনের আরো কিছু শহর ছিল- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর,

মালদহের নবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান। যদিও ইংরেজ আমলে নগরায়নের গতি ছিল খুবই মন্থর, তবুও বাংলার শহরাঞ্চলে মানুষের সংখ্যা গ্রামের মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ঢাকাও পূর্ব বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে আবির্ভূত হয়। ঢাকা এমন একটি অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, যেখানে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। ফলে ঢাকার ক্রমবিকাশ ছিল সন্দেহাতীত।

১৯২১ সালে এর জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের তুলনায় ৭৪.১ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং এ সময় ৩,৭৬২ একর আয়তনের ভূখণ্ডে ১,১৯,৪৫০ জন লোক বসবাস করত।[২৮] পরবর্তী ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এক দশকের মধ্যে শহরে মানুষের সংখ্যা বেড়েছিল ১৬ শতাংশ আর একই সময়ে গ্রামে মানুষের সংখ্যা বেড়েছিল ৬.৭ শতাংশ।[২৯] এই বৃদ্ধি পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেই প্রতিফলিত করে। ঢাকা এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্রই ছিল ঢাকা। এখানে বলা দরকার যে, পূর্ব বাংলায় ঢাকাই ছিল প্রধান শহর। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী থাকায় এর জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। মাত্র ছয় বছর প্রাদেশিক রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকার পর বঙ্গভঙ্গ রদ ও ১৯১২ সালে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারালেও ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১১ সালে প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও নগরায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। মূলত শিক্ষা, শিল্পায়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারের ফলে নগরায়ন দ্রুততর হয়।[৩০] ১৯২১ সালের মধ্যেই বাংলার নগর ও শহরের সংখ্যা এবং তাদের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও ১৯২১ সালে নগরের লোকসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬.৭ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ ১০ ভাগের চেয়েও কম।[৩১] সুতরাং পূর্ব বাংলায় যে নগরায়ন অব্যাহত ছিল তা জনশুমারিতেও স্বীকৃত।

উপসংহার

জনসংখ্যা, শিল্প, বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সুবিধাদির বিচারে ১৯২১ সালে বাংলার ১৩৫টি শহরের মধ্যে মাত্র দুটিকে প্রকৃত অর্থে নগররূপে আখ্যায়িত করা যায়। এ দুটি হলো কলকাতা ও ঢাকা। বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বিভিন্ন মফস্বল শহরকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। যদিও এই শহরগুলোর অপরিকল্পিত বিকাশ পরবর্তী সময়ে পৌর এবং স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে, যেগুলো সময়ের অগ্রগতিতে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তবুও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, বিশ শতকের প্রারম্ভে এই শহরগুলোর নাগরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এই শহরগুলোর অধিকাংশই নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম

হয়। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকে নগর সংখ্যা হয় ১৫৬টি এবং নগর বসতির হার ৯.৭% (১৯৪১ সালের রিপোর্ট)। যা বাংলার নগরায়নের গতিশীল অবস্থাকে প্রকাশ করে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. Philip M. Hauser & Leo F. Schnore (ed.), *The Study of Urbanization*, Third Print, (New York-London-Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1967), 9.

২. *The New Encyclopedia Britannica*, Vol. II, (1975): 951.

৩. V. Gordon Childe, The Urban Revolution, Greogory L. Possehl (ed.), *Ancient Cities of the Indus*, 1st Edition, (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1979), 12-17. Gordon Childe-র মতে, বিভিন্ন সৌধ, ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা, খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শ্রেণি (শাসক, বণিক, কারিগর) এবং শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নগর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য।

৪. Ashish Bose, *Studies in India's Urbanization*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., 1974), 3.

৫. R. K. Bharadwaj, *Urban Development in India*, First Edition, (Delhi: National Publishing House, 1974), 1.

৬. Raymond & Bridget Allchin, *Origin of a Civilization*, (New Delhi: 1997), 242-243; উদ্ধৃত, নূহ-উল-আলম লেনিন, *বাংলাদেশে নগরায়ন ও পরিবর্তনশীল গ্রামজীবন*, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৯), ৯-১০।

৭. Barrie M. Morrison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal*, First South Asian Edition, (Delhi: Rawat Publications, 1980), 12.

৮. কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), ১২।

৯. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, (চট্টগ্রাম: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২), ৪৮।

১০. B. B. Misra, *The Indian Middle Classes, Their Growth in Modern Times*, (London, 1961), 148; উদ্ধৃত, গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, ১৪৮।

১১. কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, ব্রিটিশ আমলে নগরায়ন ও পৌর প্রশাসন, *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫*, প্রথম প্রকাশ, (কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১), ৩৩৪-৩৩৫।

১২. কাবেদুল ইসলাম, *ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস (১৭৬৫-১৯৪৭)*, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০), ১৭২।

১৩. *Report on the Census of India*, 1901, Vol. I(A), India, Part-II, Tables, 29.

১৪. মোঃ মাহবুবর রহমান, 'বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় মাইগ্রেশন: তুলনামূলক আলোচনা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*। অষ্টাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। (জুন ২০০০, পৌষ ১৪০৭), ১৩৮।

১৫. সারণি-১ এ দেখানো হয়েছে।

১৬. *Report on the Census of India*, 1911, Vol. V, Bengal, Bihar, Orissa and Sikkim, Part-I, 29.

১৭. *Report on the Census of India*, 1931, Vol. V, Bengal and Sikkim, Part-II, (Tables), 9.

১৮. *Report on the Census of India*, 1931, Vol. V, Bengal and Sikkim, Part-I, (Report), 73.

১৯. *প্রাগুক্ত*, 74.

২০. *Report on the Census of India*, 1941, Vol. IV, 20.

২১. *প্রাগুক্ত*, 22-24.

২২. *প্রাগুক্ত*, 24.

২৩. *প্রাগুক্ত*, 26.

২৪. মো. আখতারুজ্জামান, নগরায়ন: মধ্যযুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগ, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৫২৮।

২৫. আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, তৃতীয় মুদ্রণ, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫), ১৭।

২৬. *Report on the Census of India*, 1921, Bengal, Vol. V, Part-I, Report, Para-78, 108.

২৭. *Report on the Census of India*, 1921, Bengal, Vol. V, Part-I, Para-89, 117.

২৮. *Report on the Census of India*, 1921, Bengal, Vol. V, Part-I, Para-78, 108.

২৯. *Report on the Census of India*, 1931, Bengal, Vol. I, Part-I, 76-77.

৩০. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলাদেশ: ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১০), ৯৭।

৩১. *Report on the Census of India*, 1921, Bengal, Vol. V, Part-I, Report, Para-77, 105.